Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 337 - 344
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 337 - 344
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বনফুলের ‘হাটেবাজারে’ : আত্মজৈবনিক বীক্ষণ

আঞ্জু মনোয়ারা বেনজির চৌধুরী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID: anjuchoudhury05@gmail.com
iD 0009-0005-2812-3605

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Human, reflected, banaful, parallel, life, curiously, critics, intricately Autobiographical Insight, Banaphul's, Hatey Bazarey.

Abstract

Humans colour their lives with their own aesthetic sense, derived from their daily experiences. This is reflected in their actions and creativity, making each individual's perception unique. In novels, we search for the author's sensitivity and inner self. This is especially true for autobiographical novels, and Banaphul's ‘Hatey Bazarey’ is no exception. In ‘Hatey Bazarey’, the story of Sadasiv, a middle-class youth, is told in a parallel narrative, which can be seen as autobiographical. The novel is based on the experiences of Balaichand Mukhopadhyay's medical life and is considered one of the best doctor-centric novels. ‘Hatey Bazarey’ is one of Banaphul's most popular novels, for which he received the Rabindra Puraskar in 1952. The novel was first published by Indian Associated Publishing and has since gone through many editions. Banaphul's literary career is marked by a scientific approach, realistic awareness, and rational analysis, which is reflected in his novels with great curiosity. Critics believe that the author's personal life experiences are intricately woven into the fabric of ‘Hatey Bazarey’, making it a unique and thought-provoking read.

Discussion

মানুষ নিজের প্রাত্যহিক জীবন থেকে তার নিজস্ব সৌন্দর্য চেতনার আলোয় রাঙিয়ে নেয়। আর সেজন্যই ব্যক্তি বিশেষের উপলব্ধি হয় তার কার্যকলাপ ও সৃষ্টিশীলতার। আর সেজন্যই উপন্যাসে লেখকের সংবেদন ও অন্তর্লীন আত্মগহনতাকেই খুঁজি। আর আত্মজৈবনিক উপন্যাস হলে তো কথাই নেই, আর বলা যেতে পারে বনফুলের ‘হাটেবাজারে’ সদাশিব নামের মধ্যবিত্ত যুবকের আত্মজৈবনিক কথা সমান্তরাল ভাবে বর্ণিত হয়ে আছে। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককেন্দ্রিক উপন্যাস হলো ‘হাটেবাজারে’। বনফুলের উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস হলো 'হাটবাজারে'। এই উপন্যাসটির জন্য ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত হন তিনি। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং থেকে, তারপর অনেক মুদ্রণ হয় এই জনপ্রিয় উপন্যাসটির। এছাড়া বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব জীবনের বাস্তবতার বিশ্লেষণকে তিনি শিল্পীর লেখনীর দ্বারা উপন্যাসের মধ্যে অভিব্যক্ত

করেছেন। বিশেষ করে বনফুলের সাহিত্যজীবনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব সচেতন যুক্তিবাদী বিশ্লেষণধর্মীর মনোভঙ্গি সুতীব্র কৌতূহলে তাঁর উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার চিহ্ন ওতপ্রোতভাবে 'হাটেবাজারে উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। বলে সমালোচকরা মতামত প্রকাশ করে থাকেন।

এছাড়া বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বহুসংখ্যক উপন্যাস রয়েছে, যার মাধ্যমে লেখক নিজেই প্রধান চরিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সেরকমই একটি উপন্যাস হলো 'হাটেবাজারে'। অথচ সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি-বিধৃত জীবনকে প্রবল উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের আদর্শনিষ্ঠ বলিষ্ঠ জীবনের উজ্জ্বলতম সুতীব্র প্রয়াসই ছিল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসক জীবন। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনে ডাক্তার ছিলেন। তাই তার অনেকগুলি উপন্যাসে ডাক্তারি জীবনের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে। 'হাটেবাজারে' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র চিকিৎসক। এই চিকিৎসক চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের পরিকাঠামো ব্যক্ত হয়েছে।

'হাটেবাজারে' উপন্যাসের কাহিনি বলতে একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে রচিত। উপন্যাসের কাহিনি বলতে নায়ক তথা ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের সম্পূর্ণ জীবন কাহিনিকে প্রত্যক্ষ কিছু ঘটনার বিবরণ দিয়ে লেখা। লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় অতীতের বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করেই স্বকীয় বাস্তবমুখী জীবনদৃষ্টির রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন সদাশিব ভট্টাচার্যের জীবন নিরিখে। আসলে লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরে থাকাকালীন সময়ে সমাজে বহু সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তাঁর এক নতুন ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে অন্ত্যজ সমাজের অগণিত, অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত সাধারণ নীচুতলার মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষ অনুভব করে তিনি তাদের হৃদয়কে জয় করতে পেরেছিলেন। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তিনি নিজের চিকিৎসক জীবনে সমাজের নীচুতলার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের যে প্রিয় মানুষ ও সম্মানের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন তা তিনি পরবর্তীকালে 'হাটেবাজারে' উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন।

বনফুলের 'হাটেবাজারে' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের ধারাটা পুরোপুরি আত্মজৈবনিক। অতএব পরিবেশের দ্বারাই মানুষ তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তা বনফুলের 'হাটেবাজারে' উপন্যাসের নায়ক চিকিৎসক চরিত্রের মধ্যে দেখিয়েছেন। আসলে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মানব জীবনের এক রহস্যময় শক্তির নিগূঢ় প্রভাব অনুভব করেছেন, যা মানব জীবনের নিষ্ফলতা বা ব্যর্থতার অন্তরালে নিদারুণভাবে দেখা দিয়েছে। তিনি সমাজের নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষের জীবনকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেছিলেন তা 'হাটেবাজারে' উপন্যাসটি পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়।

আলোচ্য উপন্যাসে দেখি, সদাশিব ভট্টাচার্যের প্রপিতামহ সুরেশ্বরশর্মা একজন গৃহী সন্ন্যাসী ছিলেন। তার ছেলে পীতাম্বর গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে একটি অফিসের কেরানী চাকরি করেন। তারপর কলকাতার বাগবাজারের বাড়িতেই সদাশিব ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। সেই শহরেই সদাশিব ভট্টাচার্যের বাল্যযৌবন কেটেছিল। সেখান থেকেই স্কুল এবং কলেজের পড়া শেষ করে মেডিকেল কলেজে ঢোকেন। কিন্তু মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করার আগেই মনমোহিনীর (মনু) সঙ্গে বিবাহ হয়। বিয়ের সময় সদাশিব ভট্টাচার্যের বয়স ছিল ২২ এবং স্ত্রী মনুর ১২ ছিল। সদাশিব ভট্টাচার্য বিয়ের পর ডাক্তারি পাস করেন। তারপর ডাক্তারি পেশার ক্ষেত্রে তিনি অনেক জায়গায় ঘুরাফেরা করেছিলেন।

এছাড়া উপন্যাসের নায়ক ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের স্ত্রী যৌবনে মারা গেছেন। একটি মাত্র মেয়ে সোহাগিনী, সে বিবাহিতা, সে স্বামীর সঙ্গে বিলেতে থাকে। জামাই সুজিত বড়লোকের ছেলে, বড় চাকরিও করে, কেবল দু-বার সদাশিবের কাছে আসে। তারপর উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায়, সদাশিব ভট্টাচার্য বিহারে থাকাকালীন সময়ে চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার পর সেখানেই একটি বাড়ি কিনে ভাইপো চিরঞ্জীব ও ভাইপো বউকে নিয়ে থাকেন। এছাড়া রাঁধুনীর মধ্যে ঠাকুর আজবলাল, অথচ তিনি এই ছোট সংসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেননি। তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন বাইরের এই অলৌকিক রহস্যময় জগতে। তবে দেখা যায় ব্যক্তিগত জীবনে বনফুল সপত্নীক ছিলেন। তিনিও সদাশিব ভট্টাচার্যের মতো সুকোমল, সহানুভূতিশীল ও খেয়ালী জীবনযাপন করেছিলেন।

'হাটেবাজারে' উপন্যাসের মূল উপজীব্য হল দৈনন্দিন জীবন জীবিকার কাহিনি। বরং কাহিনির চেয়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বিচিত্রতা পাঠককে মুগ্ধ করে। এই উপন্যাসটি ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের জীবন তথা অন্ত্যজ মানুষের জীবন

নিয়ে রচিত। 'হাটেবাজারে' উপন্যাসটিতে সমাজ ও জীবন সমালোচনাই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া অসংখ্য চরিত্রের চিত্রণ এবং তাদের জীবন-প্রণালীর অভিজ্ঞতা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস। তাই বনফুল আত্মজীবনীতে লিখেছেন -

> "মোটর কিনিয়া আমার চতুর্থ লাভ হইয়াছিল। বাজারের লোকদের সহিত পরিচয় এবং হৃদ্যতা আমি প্রত্যহ মোটর করিয়া বাজারে যাইতাম। মাছ, মাংস, তরিতরকারি কিনিতাম। ক্রমশ মেছোদের সহিত, মাংস বিক্রেতাদের সহিত এবং তরকারীওয়ালা ও তরকারীউলিদের সহিত একটা ভালবাসার বন্ধনেও আবদ্ধ হইলাম। একটা নতুন জগৎ আবিষ্কার করিলাম তাহাদের মধ্যে। ইহাদের লইয়া আমি 'হাটে-বাজারে' বইটি লিখিয়াছি।"[১]

এটা বলা যেতে পারে, ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের চরিত্রটি শিল্পী নিজের ব্যক্তিগত চেনা জগতের দৃশ্যপটকে প্রতিকৃতি রূপে উপস্থাপন করেছেন। তিনি সদাশিব ভট্টাচার্যের মাধ্যমে অনেক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখার প্রয়াস করেছিলেন। তিনি ডাক্তারি জীবনের বহুবিচিত্র নীচুশ্রেণী মানুষের সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছিলেন, তাদের ঘাত-প্রতিঘাত কিছু খণ্ড খণ্ড কাহিনির সন্নিবেশে গড়ে তুলেছেন নতুন ভাবে।

ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের আগাগোড়া। উপন্যাসটি অতীত ও বর্তমান এই দুটি ধারাকেই অবলম্বন করে রচিত। সদাশিব ভট্টাচার্য যখন চাকরি করতেন তখন চোখে দেখাও ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলিকে তিনি ডায়েরি আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন, আবার তিনি যখন চাকরি থেকে অবসর নেন তখন তিনি অতীতের দিকে চেয়ে যে খণ্ড চিত্রগুলি ডায়েরিতে লিখিত দলিল রূপে রেখেছেন তা বর্তমানে বিস্তারিত বর্ণনা করে আমাদের পাঠকমহলের কাছে তুলে ধরেছেন। ডায়েরিতে এক একটি ছোট কাহিনি আবর্তিত হলেও সেই চরিত্রের সংস্পর্শে এসে সদাশিব ভট্টাচার্যের ডাক্তারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়া সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণির দেহাতি জীবন, হাটেবাজারে ঘুরে ঘুরে অসংখ্য চরিত্রের ভিড় প্রভৃতিতে ঘিরে তার জীবন। ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মারা যাওয়া এবং ভাইপো ও ভাইপো বউ ও রাধুনীকে নিয়ে যে সংসার সেখানে সীমাবদ্ধ না থেকে, হাটেবাজারে ঘুরে সংসার সীমান্তের বন্ধন ছেড়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন বৃহৎ সংসারের মধ্যে। ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য দরদী ও খামখেয়ালী ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি চিকিৎসার মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে তাদেরকে আপন করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার জন্য তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সতস্ফূর্ত নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সম্মানের অধিকার। তাই 'হাটেবাজারে' উপন্যাসের মধ্যে লেখক বনফুল ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের মুখে ব্যক্ত করেছেন -

> "অনেকে হয়তো মনে করবেন আমি অসুখে বিসুখে ওদের চিকিৎসা করি বলেই ওরা আমাকে ভালোবাসে। বাইরে থেকে বিচার করলে তাই মনে হয়... ঘনিষ্ট না হলে ভালোবাসা যায় না। ...আমি ওদের উপকার করেছি বলেই যে ওরা আমাকে ভালোবাসে তা নয়, আমি ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি বলেই ভালোবাসে। আমার যারা রক্ত সম্পর্কিত, সমাজের খাতায় যারা আমার আত্মীয় বলে চিহ্নিত, তাদের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক নেই... তাই আমাকে ওরা আপন লোক মনে করে। আমি পরম সুখে আছি।"[২]

এভাবেই ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য হাটেবাজারে ঘুরে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল মেহনতী নিম্নশ্রেণির অসহায় পীড়িত মানুষদের সঙ্গে। 'হাটেবাজারে' উপন্যাসটি পড়লে বোঝা সম্ভব কীভাবে সমাজের নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষ তার আপনজন হয়ে ওঠেছিল, এমনকি নিম্নশ্রেণির দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ তার আত্মীয় হয়েছিল। উপন্যাসে বর্ণিত আছে আব্দুল, আলী, ভগলু, কেবলী, ফালতু, রহমান, কমল, জাগদম্বা, সুখীয়া, বিলাতী সহ আরও নগণ্য লোক প্রভৃতি এরা সকল যেন তার আপনজন হয় উঠেছিল। এদের মধ্যেই ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য জীবনে বেঁচে থাকার ত্যাগিদের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাদের সান্নিধ্যে এসে পেয়েছিলেন জীবনে বেঁচে থাকার প্রেরণা। তাই এই নিম্নশ্রেণির খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষকে নিয়েই তার জীবনের মুক্তির আস্বাদ ও সার্থক জীবন।

'হাটেবাজারে' উপন্যাসের বেশিরভাগ চরিত্রই মেহনত মজুরীর সাধারণ মানুষ। তাদের মধ্যে অনেকেই বাজারের মাছ, সবজির ব্যবসায়ী, ছোট দোকানদার, গাড়োয়ান, ক্রেতা ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ও জনমজুর আছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগ বিহারী হলেও বাঙালি লোকও আছেন। এমনকি হাটেবাজারে গরীব বিক্রেতারা, রিক্সাওয়ালা, কুলি, মজুর, গয়লা-গয়লালী প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য দায়িত্বভার নিয়েছেন। তিনি এই নিম্নশ্রেণির মানুষদের চিকিৎসার জন্য দ্বিধাবোধ করেননি। বরং তাদেরকে আপনভেবে নিজের জীবনের পরমতৃপ্তি সন্ধান করলেন। তাই বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় আত্মজীবনীতে লিখেছেন -

> "ভাগলপুরে বিহারীদের এবং অন্য অবাঙালিদের নিকট আমি যে আন্তরিক ভালোবাসা পাইয়াছিলাম বাঙালিদের নিকট হইতে তাহা পাই নাই। বাঙালিরা আমার খ্যাতির জন্য আমাকে কিছু খাতির করিত, কিন্তু আমাকে বেশি ভালোবাসিত বিহারীরা... ইহাদের অনেকের কথা পরে আমি 'হাটেবাজারে' গ্রন্থে লিখিয়াছি।"[৩]

উপন্যাসে চিকিৎসক সদাশিব ভট্টাচার্য এবং লেখক বনফুলের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। লেখক আসলে চিকিৎসক জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলিকে পরবর্তী সময়ে ঘটনার রূপান্তর করে 'হাটেবাজারে' উপন্যাসে স্থান দিয়ে সদাশিব ভট্টাচার্য তারই বাস্তব রূপ। এছাড়া ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য চিকিৎসা পেশায় সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রার মধ্যে অসাধারণ মানুষ হয়ে ওঠেন। আসলে তার এই অসাধারণত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, তার আপোসহীন মমতা এবং মানুষের প্রতি কঠোর বাক্যে ব্যবহারের মধ্যে কোমল স্বভাবের মানুষ। তিনি কারও কাছে মাথা নিচু করার তার চরিত্রের স্বভাবে নেই। আপন চিকিৎসা চেষ্টায় ও কর্মকুশলতায় তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আদর্শবাদী ডাক্তার হয়ে উঠলেন।

'হাটেবাজারে' উপন্যাসটি লেখক বনফুলের এক অভিনব সৃষ্টি। তিনি এই উপন্যাসে আদর্শবাদী চিকিৎসক চরিত্র চিত্রিত করেছেন, সেই সদাশিব ভট্টাচার্যের জীবনে ডাক্তারি ছাড়া তার জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, তিনি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিকে দূরে রেখে ঠিক করে নিলেন ভ্রাম্যমান ডাক্তার হবেন। সদাশিব ভট্টাচার্যের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, জীবনের শেষে আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে একসঙ্গে থাকব। কিন্তু তিনি শেষ সময়ে উপলব্ধি করলেন আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ নেই সকলই যেন শত্রু। তিনি এদের মধ্যে কাউকে আপন করে নিতে পারেননি। তিনি এই মুখোশধারী ভদ্রতার আড়াল থেকে দূরে যেতে চেয়েছিলেন, তাই 'হাটেবাজারে' উপন্যাসে দেখা যায়, ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য ভেবেছিলেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ভণ্ডামির মুখোশ পড়বার তার ইচ্ছা নেই। এমনকি টাকার জন্য তার কোন প্রবৃত্তি নেই, দরকারও নেই, অথচ তিনি জীবনে যা রোজগার করেছেন এটাই তার পক্ষে যথেষ্ট দিল। তাই চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য মুখোশধারী ভদ্র সমাজে চুপ করে বসে থাকা তার চরিত্রের স্বভাবে ছিল না। সেজন্য তিনি ঠিক করে নিলেন ডাক্তারি ছাড়া তার কিছুতেই প্রবৃত্তি নেই। 'হাটেবাজারে' উপন্যাসে দেখা যায়, ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের চরিত্রে মানসিক দ্বন্দ্ব বিচলিত হতে দেখা যায়। তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপলব্ধি করেছিলেন -

> "তিনি টাকা রোজগার করতেই চেয়েছিলেন এবং প্রচুর টাকা রোজগার করতে পেরেও ছিলেন। কিন্তু টাকা রোজগার করতে করতে জীবনের শেষের দিকে এসে হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জেগেছে এ সব কিসের জন্যে করেছি? কার জন্যে?"[৪]

ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার পর অতীতের স্মৃতি স্মরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অনুভব করলেন ভালোবাসার মতো কেউ নেই, স্ত্রী তো যৌবনে মারা গিয়াছে, একটিমাত্র মেয়ে ছিল সে বিবাহ করে চলে গেছে, তাই তিনি কার জন্য এতো দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রম করেছেন। তাই সদাশিব ভট্টাচার্য চাকরি থেকে যখন অবসর-প্রাপ্ত হন তিনি থেমে থাকেন নি। তখন তিনি চিকিৎসা করার জন্য একটি স্টেশন ওয়াগণ কিনলেন। তাছাড়া তিনি নিজের জীবনকে সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় তৈরি করে, হাটেবাজারে গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা করতে লাগলেন। সদাশিব ভট্টাচার্য গাড়িটির বর্ণনা করলেন -

> “খুব বড় একটা স্টেশন ওয়াগন কিনলাম। তাতে শোবার জায়গা, রাধবার জায়গা, এমন কি ছোটখাটো একটা ড্রইংরুমের মতো ও আছে। শতকরা আশীটা অসুখ যেসব সাধারণ ওষুধ দিয়ে সারে সেগুলোও অনায়াসে রাখা যাবে ওতে। প্রচুর জায়গা আছে গাড়িটাতে।”[৫]

আলোচ্য ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসের দেখা যায় উপন্যাসের নায়ক ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য চিকিৎসা করবেন পয়সা রোজগারের জন্য নয়, নিজের মনের আনন্দের ত্যাগিদে। তাই সাধারণ নিম্নশ্রেণি মানুষের ভিড় সেখানেই লেগে থাকতো। প্রয়োজন হলে রোগীর বাড়িতে পর্যন্ত যেতেন তিনি। এছাড়া সদাশিব ভট্টাচার্য একসময়ে সরকারি ডাক্তার ছিলেন যেমন তেমনি এখন ভ্রাম্যমান ডাক্তার হয়ে সমাজের চিকিৎসা করতে লাগলেন আরোগ্য নিকেতনের আশ্বাস নিয়ে। তাই ধীরে ধীরে সদাশিব ভট্টাচার্যের বাড়ি ক্রমে ক্রমে দাতব্য চিকিৎসালয় ও সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের আশ্রয় স্থল হয়ে উঠেছিল। উপন্যাসে বর্ণিত আছে ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য যখন গাড়িটি নিয়ে হাটেবাজারে ঘুরতে লাগলেন তিনি প্রথমেই মাছের বাজারে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর একটা বুড়ি মেছুনি ডাক্তারকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে ওঠে। তারপর সদাশিব ভট্টাচার্য আব্দুলের খোঁজ নিলেন। আব্দুল আসার পর সদাশিব ভট্টাচার্য তাকে মাছ খেতে বললেন এবং এক টুকরো মাছ বের করে আব্দুলের মুখে গুঁজে দিলেন। তারপর টিফিন কেরিয়ারটা দড়াম করে ফেলে চালপট্টির দোকানের দিকে হনহন করে চলে গেলেন। এভাবেই নাটকীয় মুহূর্ত দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। আসলে ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের চরিত্রই বিচিত্র ধরনের। তার চরিত্রের মধ্যে কোনো প্রকার ন্যাকামি, ভণ্ডামি কোনো কিছুরই সুযোগ দেখা যায়নি এবং অন্য কেহকে প্রশ্রয় দেননি। ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসে আমরা দেখি, আব্দুল টিফিন কেরিয়ারটি নিয়ে যখন সদাশিবের গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো তখন সদাশিব ভট্টাচার্য ক্ষণকাল নিষ্ফলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে অত্যন্ত কোমলকণ্ঠে বললেন - “আজ কি হয়েছিল তোরে। অমন পচা মাছটা আমাকে দিলি।”[৬]

প্রসঙ্গত বলা যায়, আসলে ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য দরদী ও খামখেয়ালী, ন্যায়পরায়ণ, কর্তব্যশালী ব্যক্তিত্বের আদর্শবাদী পুরুষ ছিলেন। ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের চরিত্রটি সদাশিবত্বের সম্ভাবনা নিগূঢ়ভাবে প্রলুব্ধ ছিল তার চরিত্রের মধ্যে, ফলে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ধারাবাহিকতায় পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসটি আগাগোড়া পাঠ করার পর কয়েকটি খণ্ডিত টুকরো টুকরো জীবনালেখ্য পাঠকমহলে সাড়া দিয়েছে, তার মধ্যে ছিপলী, আজবলাল, মালতী, আব্দুল, আলী, ভগলী, রহমান প্রভৃতি চরিত্র যেন একান্ত বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপট অবলম্বনে রচিত। এছাড়া হিস্টিরিয়াগ্রস্ত সন্তানহীন মালতী, ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী ইনজেকশন ব্যবহার করেছেন যদি সন্তান হয় একথা যেনেও তার কোনোদিন সন্তান হবে না। ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসে দেখা যায় কেবলীর স্বামী নারাণকে যখন পুলিশ গ্রেপ্তার করে নেয় তখন সদাশিব ভট্টাচার্যের সহায়তায় স্বামীকে জেল থেকে বের করে নেয়। এক সমাজপ্রধানের ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাবে নারাণকে পুলিশ ধরে নিয়েছিল। উপন্যাসে দেখা যায নারাণ দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায় কিন্তু ডাক্তার সদাশিবের দরদী কোমল ভাবাপন্ন মন নিয়ে তাদের জীবনকে উদ্ধার করে দিলেন। আবার উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় ছিপলী সম্পর্কে ডাক্তার সদাশিব ভটাচার্য বলেছেন -

> “আশ্চর্য মেয়ে এই ছিপলী। সদা হাস্যমুখী, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে।”[৭]

ছিপলীর স্বামী জিতুর ইনজেকশন ব্যবহার করতেছে, কিন্তু ভালো হবে যে, অর্থাৎ আরোগ্যলাভের সম্ভাবনাটুকু কম, তবুও ছিপলী স্বামীকে বাঁচানোর জন্য প্রবল উৎসাহী। ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য যখন তাকে ফ্রী ঔষধ দিতে চেয়েছিলেন তখন সে রাজী হয় নি। বরং সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছিল। তাই ছিপলীকে নিয়ে কাহিনিটি পূর্ণতা পেয়েছে। এছাড়া ড্রাইভার আলী, মুরগিওয়ালা আব্দুল, মোটর মেকানিক কমল, ছাপোষা, বাড়ুজ্যে, শুকুর ও তার ছেলে সিদ্দিকী, স্বামী চিরঞ্জীব, মালতী, হাটেবাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা প্রভৃতি সব মিলিয়ে ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের চরিত্রের পূর্ণতা পেয়েছে। এসব চরিত্র শিল্পী কাল্পনিক কোনো কাহিনি নয়, বরং বাস্তব সত্য লোকজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে খণ্ড খণ্ড চরিত্রকে তিনি ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসের নায়ক সদাশিবের মুখে ডায়েরি আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসে ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য চিকিৎসা করতে করতে বলেছেন -

> “রোগী আসে, রোগী যায়। কেউ বাঁচে, কেউ মরে। কিন্তু মনের উপর কেউতো দাগ রেখে যায় না। আমার ব্যাংক ব্যালেন্স কিছু বাড়ে শুধু। মনটা যেন নির্মম আয়নার মতো। কোনও ছবিই ধরে রাখে না। যদি ক্যামেরার মতো হত তাহলে কি ভালো হত? অত ছবি রাখতাম কোথায়? মনের চিত্রশালায় অত জায়গা কি আছে? হঠাৎ মনে হল আছে বই কি। অনেক জায়গা আছে। কিন্তু রাখবার মতো ছবি একটাও পেয়েছি কি?”[৮]

জীবনকে জানার জন্য খুঁটিয়ে গভীরে ডুব দিয়ে একান্ত আগ্রহ ছিল লেখক বনফুলের। তিনি চিকিৎসা করতে করতে ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য মানব হৃদয়ের স্বভাবের টানাপোড়নে উভয়সংকট দ্বিধাগ্রস্ত হয়েই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এইসব সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন আত্মমুক্তির আশ্রয়। এছাড়া লেখক বনফুলের নৈর্ব্যক্তিক শিল্পীকলার অভিপ্রায় নিহিত রয়েছে ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের চরিত্রকে নির্মাণ করতে। এই জন্যই তিনি ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসে ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যকে জীবনসংকট থেকে উত্তীর্ণ করেছেন স্বজীবনের প্রতি লেখক বনফুল অন্তরঙ্গ প্রত্যয়ভাবনা দিয়ে। 'হাটেবাজারে' উপন্যাসের মধ্যে দাসত্ব প্রথা বর্ণনা করেছেন বনফুল ডাক্তার সদাশিব চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ডাক্তার সদাশিবকে ঘিরে এরকমই একটি চরিত্র হলো গীতা। গীতা ডাক্তার সদাশিবের সাহায্যে তার স্বামীকে দাসশ্রমের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আনে। উপন্যাসে দেখা যায় গীতা ডাক্তার সদাশিবের কাছে এসে একদিন তার জীবনের কাহিনির কথা মৃদুকণ্ঠে বলল। সে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়েছে স্বামী দুশ্চরিত্র মাতাল। শাশুড়ী দাজ্জাল। এমনকি পরিবারের সকলের সেবা তাকে করতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই পর্যন্ত মারধর করে। এছাড়া তাকে তার স্বামীর মালিকের বাড়িতেও কাজ করতে হয়। তারপর ডাক্তার সদাশিবের সাহায্যে গীতা দাসত্ব প্রথা থেকে বেরিয়ে আসে। এবং পরে ডাক্তার সদাশিবের সাহায্যে পাঠশালায় শিক্ষকতা কাজে যোগদান করে নিজের আপন ভাগ্য জয় করার সুযোগ পেয়েছিল। উপন্যাসে দেখা যায় সদাশিব ভট্টাচার্য বারবার অনুভব করেছিলেন যে দাসত্ব প্রথা এখনো আমাদের অসুস্থ দুরারোগ্য ব্যাধি সমাজে লোপ পায় নি। তাই ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য বলেছেন, কেবল বাইরের মুখোশধারী সমাজে এ রূপটা বদলেছে কেবলমাত্র কিন্তু বর্তমান সময়ে দাস-দাসী বিক্রয়ের হাটেবাজারে না থাকলেও অসুস্থ সমাজের বুকের উপরই ঘরে-ঘরে সে হাট বসেছে। তাই ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য বলেছেন—

> “গীতার সেই বামন মহাজন সেদিন এসেছিল তার দলিলপত্র নিয়ে।... বামন বলছে এখনও দেড়শ টাকা বাকি আছে।”[৯]

আসলে প্রতাপশালী এই সকল জমিদারের কাছে অসহায় নিম্নশ্রেণির মানুষেরা প্রতিনিয়ত এই ব্যাধিযুক্ত সমাজে তাদের আত্মমর্যাদা বিক্রয় করছে। সুতরাং দারিদ্রতার প্রকোপে তাদের এসব না করে অন্য কোনো পথ নেই।

‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসের ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের চরিত্রের আরেকটি দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি যখন হাজীপুর হাটে একটি প্রকাণ্ড মাঠে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নির্জন প্রকৃতির কোলে বিশ্রাম নিয়েছিলেন তখন তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নানা জায়গায় ভেসে ভেসে বেড়িয়েছিল ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের প্রকৃতিমুগ্ধ মন। তিনি প্রকৃতির এই রহস্যময় লীলায় নিজেকে একা থাকতে ভালোবাসেন। তিনি প্রথম যখন জীবন আরম্ভ করার প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন, ভেবেছিলেন এজীবন কাটবে কীভাবে। কিন্তু দেখতে দেখতে কালের স্রোতের প্রবাহে এই সাধারণ মানুষের ভিড়ে অবিরাম গতিতে তার জীবন কেটে গেল। আজ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি উপলব্ধি করে বলেছেন, যে ভালোবাসার জন্য এ মন ভেসে ভেসে সময়ের স্রোতে ঘুরে ঘুরে চলছিল এই মুখোশধারী সমাজে, আজ যেন সে আকাঙ্ক্ষিত সুধা এই নিম্ন মধ্যবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণির ভিড়ে মুক্তির আস্বাদ লাভ করলেন। এমনকি যুগের এই অস্থিরতার আবর্তে তার জীবনের মূল্যবোধ বিভ্রান্ত হয়নি। তাই লেখক বনফুলের 'হাটেবাজারে' উপন্যাসের মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির গূঢ় সম্পর্ক রহস্যের তাৎপর্য অন্বেষণের প্রয়াস স্পষ্ট চোখে পড়েছে। অতএব উপন্যাসের মধ্যে ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য বলেছেন -

> “আমি নানাস্থানে ঘুরি, নানা স্তরের সঙ্গে আমার দেখা হয়, বর্তমান গভর্নমেন্টের উপর কাউকে সন্তুষ্ট দেখি না। ধনী-দরিদ্র সবাই এই শাসন ব্যবস্থার উপর চটা। ...সুতরাং চোর ডাকাত জুয়াচোর কালোবাজারীতে দেশ ভরে গেছে।”[১০]

‘হাটেবাজারে’র উপন্যাসটির পটভূমি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লেখা হলেও উপন্যাসের নায়ক সদাশিব ভট্টাচার্যের চরিত্রের মানসিকতায় মানুষের বিপন্নতা দেখে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনমুক্ত দেশ গড়তে সাফল্য লাভ করলেও সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের সংকট মুক্ত হয়নি। তারা পুঁজীবাদী শাসন ব্যবস্থার চাপে নিজের আত্মসম্মান বিচূর্ণ করে চলেছে। ফলে ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য তাদের এই লাঞ্চিত বন্ধন মোচনের বহুমুখী প্রয়াস থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাই সদাশিব ভট্টাচার্য উপন্যাসের মধ্যে তার চরিত্রের অস্বস্তি দিকটির অনুভব দেখা যায় -

> “তিনি যেন হঠাৎ একটা রুঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী গৃহস্থের নগ্নরূপটা তাকে পীড়া দিচ্ছিল। ...ভারত স্বাধীন হযে এরাই তো সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হয়েছে।”[১১]

তবে এই ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লেখা হলেও উপন্যাসটি রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। স্বাধীনতা লাভ করার কয়েক বছর পর উপন্যাস রচনা করার ছলে কিছু বেকার সমস্যা, কালোবাজারী দালালদের নিম্নশ্রেণি মানুষের প্রতি তীর অত্যাচার ও অভাব-অভিযোগ দুর্নীতিতে জীবনের কিছু আলেখ্য লেখক তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সমাজ বাস্তবতাকে ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসের নায়ক সদাশিব ভট্টাচার্যের নিরিখে উপস্থাপন করলেন।

জীবনের রূপ বহু বিচিত্র ধরনের। সেই বহুরূপী সাধারণ মানুষের জীবনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাকে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তার সৃজন প্রতিভার মাধ্যমে খণ্ডিত চিত্র রূপায়ণ করে চোখে দেখা জগতকে ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসে বিশ্লেষণধর্মী রূপায়ণ করে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি বাস্তব জীবনের রক্তমাংসের কথা তুলে ধরেছেন 'হাটেবাজারে' উপন্যাসে। ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিরূপে মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জটিল রহস্যময় অন্ধকার জীবনকে বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানধর্মী কৌতুহলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে যতটুকু উপন্যাসে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ঠিকতদ্রুপ শিল্পস্রষ্টা হিসাবে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় সাফল্যমণ্ডিত অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানুষের জীবন যেখানে হতাশায় নিরাসক্ত এবং ব্যর্থতায় বিকৃত সেই সংকটপূর্ণ বাস্তবজীবনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লেখক বনফুল নীরন্ধ্র অন্ধকারের মসীবর্ণ চিত্রটি বাস্তব রেখার আলোকে চিত্রিত করতে পেরেছেন বলে ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসের মতো একটি সার্থক রচনা আমাদের পাঠকবৃন্দের কাছে উপস্থাপন করেছেন।

আসলে ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তার কৌতূহলী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মন নিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের জীবনকে জানার সন্ধান করেছেন। ফলে একান্ত খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের আর্তগ্লানি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি তার সাহিত্য রচনায় চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠেছে। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'হাটেবাজারে' উপন্যাসের নায়ক ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মন নিয়ে মানসিক চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের বেঁচে থাকার আলোর সন্ধানের মূঢ়তা তার চরিত্রে যেন ধরা পড়েছে। তবে দখা যায় কোনো লেখক নিজের আত্মকাহিনির ছলেই হোক বা কোনো নায়ককে উপন্যাসে স্থাপিত করেই হোক, সাধারণত এজাতীয় আত্মকাহিনিমূলক উপন্যাসের ভিত্তিতে লেখকের জীবনের প্রভাব পরে বলে পাঠকবৃন্দের কাছে এদের একটা বিশিষ্ট মূল্য থাকে।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মানবদরদী প্রত্যয়নিষ্ঠ মানবতাবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি শুদ্ধ ও সুস্থ জীবনবোধে বিশ্বাসী ছিলেন ফলে সাধারণ মানুষের প্রত্যয়কে জীবন্ত করে তুলার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্খাটুকু বনফুলকে অনুপ্রেরিত করেছিল। তাই এই সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষকে মুক্ত আকাশে মুক্তির আশ্বাস জানিয়ে তাদেরকে আরোগ্য লাভের কামনার জন্য ছড়িয়ে দিয়েছেন শিল্পীপ্রাণের মানসমুক্তির পিপাসাটুকু। এবং উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য ছিপলীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই অন্ত্যজ শ্রেণি মানুষের মধ্যে তাঁর জীবনের অবসান ঘটে ও তাদের মধ্যেই মুক্তির তৃপ্তি পেলেন। এখানেই ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসের সদাশিব ভট্টাচার্যের চরিত্রের সার্থকতা। তিনি ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসের মধ্যে যেসব মোটর মিস্ত্রি, গ্যারেজ, ড্রাইভার এবং স্থানীয় নিম্নবর্ণের মানুষদের পরিচয় পাওয়া যায় তা ব্যক্তি বনফুল চিকিৎসক পেশার ক্ষেত্রে তাদের সংস্পর্শে এসে বিনাসক্রান্ত জীবনের সঙ্গে যেভাবে ঘনিষ্টভাবে অন্তরলোকে নিবিড়ভাবে জড়িত হয়েছিল তা তিনি পরবর্তিকালে ‘হাটেবাজারে’ উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন।

সমাজের এই অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা আপংক্তেয় মানুষের আপনজন হয়ে তাদের এই অভিশপ্ত জীবনের আসন্ন ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদেরকে অন্ধকারে মসীবর্ণ জীবনকে আকড়ে ধরে, আরোগ্য-নিকেতনের জীবন প্রেরণার সার্থক উৎসাহ রূপে অভিনব নিদর্শন হিসাবে বাংলা সাহিত্য জগতে এক অনবদ্য অবদান।

Reference:

১. নন্দী, ডঃ উর্মি, ‘বনফুল : জীবন মন ও সাহিত্য’, তদেব, পৃ. ১৯৬
২. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (তৃতীয় খণ্ড), নিউবেঙ্গল প্রেস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ৭৫৩, ৭৫৪
৩. মিত্র, ডঃ সরোজমোহন, ‘বনফুলের সাহিত্য ও জীবন’, তদেব, পৃ. ১১৪
৪. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (তৃতীয় খণ্ড), তদেব, পৃ. ৭৭
৫. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (তৃতীয় খণ্ড), তদেব, পৃ.৭৩৯
৬. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (তৃতীয় খণ্ড), তদেব, প্. ৭০৭
৭. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (তৃতীয় খণ্ড), তদেব, পৃ. ৭৭৭
৮. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (তৃতীয় খণ্ড), তদেব, পৃ. ৭১৫
৯. শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (তৃতীয় খণ্ড), তদেব, পৃ. ৭৭৭
১০. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৭৪৫
১১. মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ, ‘বনফুল উপন্যাস সমগ্র’, (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৭৯১